দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহার

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারত একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে ভারত ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। বলা বাহুল্য দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভবিষ্যৎও একই সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। তবে এই গ্রথিত হওয়া ব্যাপারটি প্রথমে ছিল অলক্ষ্যে। কেননা ভারত ইতিহাসের পর্ব যেমন স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী এই দুই পর্বে বিভাজ্য, দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ইতিহাসের পর্ব বিভাজন এত সহজেই সম্ভব নয়। কোচবিহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী দুই পর্বের মাঝখানে একটি অন্তর্বর্তী পর্ব আছে যাকে কোচবিহারের Transition বা উত্তরণের স্তরের পূর্ববর্তী ধাপ বলে চিহ্নিত করা যায়। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় কোচবিহারের মহারাজা Instrument of Accession বা ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেননি। স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্বর্তী এই সময়ের কোচবিহার রাজ্যের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জনমানসে থেকে গেছে অসীম কৌতুহল।

পরিস্থিতি বিশ্লষণে দেখা যায় ব্রিটিশ সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারত সহ দেশীয় রাজ্যগুলির উপর থেকে প্রত্যাহার করার পর স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় রাজ্যগুলি আইনত স্বাধীন হয়ে যায়। বেশিরভাগ দেশীয় রাজ্যই ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগদান করে। কোন ডোমিনিয়নেই যোগদান থেকে বিরত থাকে জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগর, কোচবিহার, ত্রিপুরার মত কয়েকটি রাজ্য। মধ্যবর্তী এই অবস্থায় নয়াদিল্লীর ভারত সরকারের সাথে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত হত Stand Still Agreement বা স্থিতাবস্থার চুক্তি দ্বারা। এই চুক্তির দ্বারা পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এই কয়েকটি বিষয় বাদ দিয়ে বাকি ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। বস্তুত এই অবস্থা ছিল প্যারামাউন্ট ক্ষমতা লোপ ও Instrument of Accession বা ভারতভুক্তির দলিল স্বাক্ষরের মধ্যবর্তী শূণ্যতা পূরণ। (১) তবে প্রতিটি ঘটনা সংঘটনের পিছনেই যেমন কোন নেপথ্য ঘটনা থাকে কোচবিহারের ভারতভুক্তির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কোচবিহারের ভারত তথা পশ্চিববঙ্গ ভুক্তিও এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের ফল। অবশ্য বিভিন্ন কারণের এক সমষ্টিগত ফল হিসাবেই এই ঘটনাগুলি দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে পরিসংখ্যানগত হিসাবে স্থানীয়রা সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও শতাধিক বছর ধরে রাজ্যের উচ্চ পদগুলি অভিবাসী বাঙালীদের ও অন্যান্য বহিরাগতদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় ক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছিল। নিচে তালিকা দেওয়া হল যাতে একটি সামগ্রিক ধারনা পাওয়া সম্ভব হয়—

নাম	পদ ও বিভাগ	বছর
১) কালিকা দাস দত্ত	দেওয়ান	১৮৬৯
২) শরৎচন্দ্র ঘোষাল	নায়েব আহিলকার, বিচার বিভাগ	১৯৪৯
৩) হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী	বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত	(মন্ত্রীসভা প্রথা চালু হবার পর)
৪) যাদব চক্রবর্তী	বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত	(মন্ত্রীসভা প্রথা চালু হবার পর)
৫) সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী	মন্ত্রী	(নির্বাচন প্রথা চালু হবার পর)
৬) রায় করালীচরণ দত্ত	রাজস্ব, কারা, পুলিশ, পূর্ত, রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, নির্বাচন, দার্জিলিং-এর সম্পত্তি, রাজকীয় উদ্যান	

নাম	পদ ও বিভাগ	বছর
৭) রায় চৌধুরী সুশীল কুমার চক্রবর্তী	শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং অন্যান্য	১৯৪০-১৯৪১

মহকুমা ভিত্তিক নায়েব আহিলকারদের নামের তালিকা

	সদর
১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায়	মালকাছারি নায়েব আহিলকার
২) শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বক্সি	মালকাছারি নায়েব আহিলকার
৩) মৌলবী আহমেদ হোসেন প্রধান	সদর নায়েব আহিলকার
৪) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সেন	অতিরিক্ত নায়েব আহিলকার
	দিনহাটা
১) শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য	নায়েব আহিলকার
২) শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী	অতিরিক্ত নায়েব আহিলকার
	মাথাভাঙ্গা
১) মৌলবী বজলে রহমান সরকার	নায়েব আহিলকার
২) শ্রীযুক্ত ক্ষিতেন্দ্র নাথ লস্কর	নায়েব আহিলকার
	মেখলিগঞ্জ
১) শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	নায়েব আহিলকার
	তুফানগঞ্জ
১) এন. সি. মুস্তাফি	নায়েব আহিলকার

এছাড়াও আবগারী, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, চাকলাজাত সম্পত্তি, কৃষি বিভাগ অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাছাড়া অবাঙালী অভিবাসীরাও রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অলঙ্কৃত করছিলেন যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত। যেমন— হিম্মত সিং. কে. মাহেশ্বরী—প্রধানমন্ত্রী

২) এ. আর. সেকন্ডি— মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারীক

৩) এল. বি. গড— ইঞ্জিনিয়ার

৪) হনুমান শাহর রাউথ— রাজস্ব সচিব

৫) শ্রী আই. শেখর— শিক্ষা সচিব ও জনসংযোগ আধিকারীক

৬) পি. কে. কাউল— কম্যান্ডান্ট, হোম গার্ড

৭) জি. সি. ফুকন— পুলিশ কমিশনার

৮) ক্যাপ্টেন আর. গ্রে— রাষ্ট্রের বিমান চালক

৯) শ্রী আর. কে. সিং— মিনিস্টার -ইন- ওয়েটিং (২)

স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষণীয় যে, পদস্থ চাকরীতে বহিরাগত বা অভিবাসী বাঙালীদের ও অবাঙালীদের আধিপত্যের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠছিল। তাছাড়া রাজ্যের জমিজমার বেশিরভাগ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই ক্ষোভ সর্বব্যাপী হয়ে উঠছিল। তবে কোচবিহারী ও বহিরাগতদের দ্বন্দ্বে কোচবিহারী মন্ত্রীরা জমিজমা চাকরী ইত্যাদি বিষয়ে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

এই ব্যাপারে হিতসাধনী সভা খুব সরব ছিল। হিতসাধনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮ই মে, ১৯৪৭-এ। সংস্থার

পদাধীকারী ছিলেন ঃ সভাপতি— খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, সহ-সভাপতি—সতীশ রায় সিংহ সরকার, সম্পাদক— জলধর সাহা। এঁদের নামে জনপ্রিয় সঙ্গীত ছিল—

" ওঠ্‌রে নেটিভ ভাই, জাগরে নেটিভ
তাড়াও ভাটিয়া সব
গর্জি উঠিলা সতীশ সিংহ
তুলি হুঙ্কার রব।
এস দেশপ্রাণ জলধর এস
সতীশ সঙ্গে করে
ধরণীর সাথে এস আনসার
করি গলা ধরাধরি।
কোথায় মজির, মজিলা এদেশে
গেল ভাটিয়ার হাতে
জেল খাটা পূর্ণেন এসো
খান চৌধুরী সাথে।" (৩)

এই গানটি হায়দ্রাবাদের নিজামের আত্মীয় খসরু জঙ্গের মস্তিষ্কপ্রসূত। বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি ও দেশী ভাটিয়া দ্বন্দ্ব তৈরি করার জন্য এই ধরনের কবিতা জনমানসের কাছে পল্লবগ্রাহী ছিল। (পৃঃ ৩২, বিমান চক্রবর্তীর অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ।)

কিন্তু প্রকৃত ভাটিয়া অর্থাৎ মারোয়ারীরা এই অন্দোলনের লক্ষ্যের বাইরে ছিল। কেননা তারা এই সংস্থায় অর্থসাহায্য করত। তবে মনে রাখা দরকার এই বহিরাগতরা এতদঞ্চলে যোগ্য লোকের অভাবে প্রশাসনের আমন্ত্রণেই এখানে এসেছিল। কিন্তু সার্বিক প্রচেষ্টা স্বত্বেও যখন কোচবিহারের মাটি থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদ করা গেলনা তখন হিতসাধনী সভার মুসলমান সদস্যরা কোচবিহারের পাকিস্তান ভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই সংস্থার সভাপতি খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা যিনি কোচবিহারের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন তিনি কোচবিহারকে মুসলমান সংখ্যাধিক্য করার জন্য রংপুর ও ময়মনসিংহ থেকে লোকজন এনে বসতি করানো শুরু করেন। ভূমিহীন মুসলমানদের অনেকেই স্থানীয় ক্ষত্রিয় মেয়ে বিয়ে করে স্থায়ী বাসিন্দা হন। রাজস্ব আদায় বাড়ছিল দেখে মহারাজাও দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেন।

ভারত বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে চর্মশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার উদ্দিন আহমেদ আমানত উল্লার আমন্ত্রণে কোচবিহারে আসেন। আমানত উল্লার আমন্ত্রণে কোচবিহারের মুসলমানদের মুক্ত করতে অভ্যুত্থান করার লক্ষ্য নিয়ে আসেন সিরাজগঞ্জ থেকে মুজাহিদ ফৌজের আসাদুল্লা সিরাজী। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রচার আধিকারীক আব্বাসউদ্দীনের ভাই ছিলেন কোচবিহারের প্রচার সংগঠক। (পৃঃ ৩৬, 'The Merger Movement of Erstwhile Cooch Behar State Within Indian Union - Biman Chakraborty)

বিপরীতে প্রজামন্ডল বা পরবর্তীকালে State Peoples Conferences রাজকীয় অনুগ্রহ পায়নি। ধর্মনিরপেক্ষ এই সংগঠনটি ছিল ভারতভুক্তির সমর্থক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোচবিহার শাখা কোচবিহার রাজ্য কংগ্রেস প্রথমে জলধর মিত্র ও হীরেন দত্তকে নিয়ে গঠিত হয়। এঁরা এবং কমিউনিষ্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক সব দলই ছিল ভারভুক্তির সমর্থক। (পৃঃ ৩৭, বিমান চক্রবর্তী)।

তাছাড়া পুলকেশ দে সরকার ও তারাপদ চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার পিপলস এ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য ছিল কোচবিহার ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অতএব কোচবিহারের ভারতভুক্তিই সংগত। কোচবিহারের বাইরে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মত চৌদ্দ জন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবি বিবৃতি দানের মাধ্যমে কোচবিহারের ভারতভুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। (পৃঃ ৩৯, বিমান চক্রবর্তী)

তবে শুধু হিতসাধনী সভাই নয়, মহারানী ইন্দিরা দেবী ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সতীশ সিংহ রায় কোচবিহারকে ভারত ইউনিয়নের বাইরে রাখার সমর্থক ছিলেন । অবশ্য মহারানী ইন্দিরা দেবী এই অভিযোগ পরবর্তীকালে অস্বীকার করেন। দিনহাটা মহকুমা হাকিম আহমেদ হোসেন প্রধান ও কোচবিহারের প্রভাবশালী 'এ্যাকাউন্টেন্ট' আফসার আহমেদ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কোচবিহারকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বলেছিলেন সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে গণভোট হবে। যাই হোক এই সংকটময় সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অন্যতম জাতীয় নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার 'জনমত' পত্রিকা সম্পাদক চারুচন্দ্র সান্যাল। এদিকে আবার জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলের অধিবাসীদের একাংশ ডুয়ার্সকে কোচবিহারের সঙ্গে সংযুক্ত করে বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্য গঠনের এক প্রয়াস শুরু করেছিলেন এবং তদানিন্তন মহারাজ নিজেও নাকি এই দাবীর সমর্থক ছিলেন (৩)। যাই হোক শেষ পর্যন্ত 'সকল তর্ক তুচ্ছ করে' ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ২৮ শে আগষ্ট কোচবিহারের মহারাজা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি ভি. পি. মেননের সঙ্গে সাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করে ও 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের পরিচিতি লাভ করে (সূত্র ঃ পৃঃ ৫১৫-৫১৬, পরিশিষ্ট- ৬, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা)।

ভারতভুক্তির প্রশ্নের নিরসন হবার পর যে প্রশ্নটি আসে তা হল কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ অথবা আসাম কোন অঙ্গ রাজ্যের অঙ্গিভূত হবে। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আসামের সাথে কোচবিহারের ভৌগোলিক সম্পৃক্ততা ও ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ সাদৃশ্যের কারণে কোচবিহারের আসামের সাথে সংযুক্তিকে সমর্থন করে। তবে আসামের রাজ্যপালের উপদেষ্টা নারি রুস্তমজী কোচবিহারের পশ্চিম বঙ্গভুক্তির সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু কোচবিহার ষ্টেট কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির সমর্থক ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল কোচবিহারের অধিবাসীরা মূলতঃ বাংলাভাষী। কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ ও মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ বাংলাতেই কাব্য রচনা করেছেন। তাছাড়া ভৌগোলিক সম্পৃক্ততা, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য এবং স্বাধীনতাপূর্ব যুগের রাজনৈতিক সংযোগ, কোচবিহারের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি, বাংলা সরকারের চাকরীতে কোচবিহারের প্রজাদের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া যা অন্য রাজ্যে স্বীকৃত ছিল না, কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভরতা ইত্যাদি কারণে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তিই শ্রেয়। (পৃঃ ৪২-৪৩, বিমান চক্রবর্তী)।

অবশেষে ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। (পৃঃ ৪১৪-৪১৫, কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা, আনন্দ গোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা)

দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পরিণত হল পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় জেলা কোচবিহারে। ভারতভুক্তি ও পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পর কোচবিহারের দীর্ঘ দিনের ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সমাপ্তি হল, শুরুহল নতুন অধ্যায়ের। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে ধন, মান, জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পেয়ে ওপার বাংলা থেকে দলে দলে বাস্তুহারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমঙ্গে ছুটে এলেন, স্বাভাবিকভাবে কোচবিহারও তার ব্যতিক্রম হল না। ফলে কোচবিহারের জনসংখ্যাগত ভারসাম্যে এল বিপুল পরিবর্তন। নিচে একটি সারণীর আকারে তা দেখানো হল —

বছর	মোট জনসংখ্যা	১৯০১ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরে সূচক	পুরুষ	মহিলা
১৯০১	৫৬৫১১৬	১০০	৩০৩৪১৩	২৬৪৭০৩
১৯১১	৫৯১০১২	১০৫	৩১৫৪৩৬	২৭৫৪৭৬
১৯২১	৫৯২৪৮৯	১০৫	৩১৫৬২৮	২৭৬৮৬১
১৯৩১	৫৮৯০৫৩	১০৪	৩১২২৬৫	২৭৬৭৮৮

বছর	মোট জনসংখ্যা	১৯০১ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরে সূচক	পুরুষ	মহিলা
১৯৪১	৬৩৮৭০৩	১১৩	৩৩৯৮৪৫	২৯৮৮৫৮
১৯৫১	৬৬৮৯৪৯	১১৮	৩৬০৬৭০	৩০৮২৭৯
১৯৬১	১০১৯৮০৬	১৮০	৫৩৯৬৯৪	৪৮০১১২
১৯৭১	১৪১৪১৮৩	২৫০	৭৩৭৯৩১	৬৭৬২৫২
১৯৮১	১৭৭১৬৪৩	৩১৩	৯১৫৪৬১	৮৫৬১৮২
১৯৯১	২১৭১১৪৫	৩৮৪	১১২২৩০৬	১০৪৮৮৩৯

সার্বিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় ১৯০১ সালের জনসংখ্যারসূচককে ১০০ ধরলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটামুটি স্বাভাবিক। ১৯৬১ সালে সূচক থেকেই তা ১৮০ সূচকে পরিণত হল যা অব্যবহিত পূর্বের সূচক থেকে লাফিয়ে ৬২ সূচক বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯১ সালের সূচকে তা ৩৮৪ তে এসে পৌঁছে গেছে। ১৯০১ সালের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে জনসংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত গড়ে ৬২ সূচকের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধির আনুপাতিক হার মোটামুটি সমতা বজায় রেখেছে। এর প্রধান কারণ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের বিশেষতঃ রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার নিকটবর্তী বলে সব জেলারই লোক এলেও কোচবিহারে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই দুই জেলার অধিবাসীর আনুপাতিক হার বেশি। এর ফলে এলাকার জনসংখ্যাগত ভারসাম্যও বিপরীতমুখী হল বলা যায়।

এখানে উল্লেখ করা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এলেন তাঁরা ওপার থেকে তাদের স্মৃতি ও শ্রুতিতে বহন করে এনেছিলেন তাঁদের বহুযুগ অর্জিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে, একইভাবে তাঁরা কোচবিহারে এসেও এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাকে আত্মিকরণ করে নিলেন। ফলে পূর্ববঙ্গাগত ও স্থানীয় উভয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মিলনে নতুনতর সম্পদ তৈরি হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের চল্লিশোর্ধ অর্ধশতাধিক ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যবিশ্লেষণে দেখা যায় এঁদের মধ্যে ৩২ জনের জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে এবং এখানে বা অন্যস্থানে জন্ম, কিন্তু পৈত্রিক নিবাস পূর্ববঙ্গে তাঁদের সংখ্যাও উপেক্ষনীয় নয়।

গভীরতর বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারে। ঐতিহ্যর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেই এসেছে পরিবর্তন। তরুন থেকে তরুনতর লেখকদের কলমে সৃষ্ট কাব্যকবিতা, কথাসাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য, লোকসাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি বিষয়ক রচনায় সাহিত্যর অঙ্গন হয়েছে ভরপুর। আবার স্থানীয় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের স্রোতধারায় মিলিত হয়েছে ওপার বাংলা থেকে অভিবাসী বাঙালীদের বয়ে আনা ভাটিয়ালী, বাউল, সাম্পান মাঝির গান ইত্যাদি। ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেমন হারিয়েছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, তেমনি বিপরীতভাবে তা রাজকীয় ঘেরাটোপের বাইরে সর্বসাধারণের অঙ্গনে নেমে এসে হয়ে উঠেছে মানুষের প্রাণের সামগ্রী। শিল্পসৃষ্টি ও জনসংযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে সাময়িকপত্র ও নাটকও যেমন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে তেমনি হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনে অর্থবহ। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায় যেমন—ক) স্বাধীনতার পরবর্তী কাব্য কবিতা, খ) স্বাধীনতার পরবর্তী কথা সাহিত্য, গ) স্বাধীনতার পরবর্তী নাটক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য, ঘ) কোচবিহারের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঙ) কোচবিহারের শিক্ষার চালচিত্র, চ) কোচবিহারের সাময়িকপত্র-পত্রিকা-সাহিত্যিক অবদান— এই কয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে কোচবিহারের স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিত্র চিত্রিত করবার ও তা মূল্যায়ণের চেষ্টা করব।

যাই হোক সবশেষে যে কথাটি না বললে বক্তব্যর মাঝে থেকে যাবে অসম্পূর্ণতা তা হল দেশভাগ ভারতীয় তথা বাঙালীর জীবনে যেমন এনেছে ভাঙ্গন, অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্যোগ, তেমনি বিচ্ছেদের মাঝে মিলনের ও সৃষ্টির নতুন বার্তাও ধ্বনিত হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে বাস্তুহারা হয়ে আসা পরিশ্রমী কৃষকের সাথে এপারের কৃষকের শ্রম মিলিত হয়ে জমি হয়েছে উর্বরা, অধিক ফলনশীল। বিভিন্ন প্রকার কৃষি ফসলে ভরে উঠেছে কৃষকের গোলা,

ঠিক একই ভাবে শিক্ষা সংস্কৃতির অঙ্গনও ভরে উঠেছে নতুন নতুন সৃষ্টিতে। জনসাধারণের দাবীতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়, শিক্ষা হয়েছে মুষ্টিমেয়র নয়, বরং আমজনতার আলোর দিশারী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় এবং একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গাগত ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের সন্তান সন্ততিরা এগিয়ে এসেছে সংস্কৃতির অঙ্গনে। কোচবিহারের মাটিতে মিলিত হয়েছে স্থানীয় জনগণের ও ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, পাবনা সবার সম্মিলিত সাধনা। দুঃখের তিমিরে মঙ্গল আলোকের প্রজ্জ্বলন কোচবিহারের ক্ষেত্রে যতটা সত্য এমন হয়ত অন্য কোথাও নয়। দেশভাগের মন্থনে সৃষ্ট হলাহল বিপরীত ক্রিয়া করে যেন কোচবিহারের মাটিকে করে তুলেছে স্বর্ণময়ী।

উৎস নির্দেশ

১) M. Phil. Dissertation 'The Merger Movement of the Erstwhile Cooch Behar State with Indian Union (1946-1950) - Biman Chakraborty (অপ্রকাশিত)

২) একনজরে কোচবিহার - রণজিৎ দেব

৩) কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা - আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার (মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা)